দৈনিক বাংলা

215

তারিখ ... 7.4.78 ...
পৃষ্ঠা ... 5 .. কলাম .. 3 ...

পরীক্ষা নামক ব্যাপার

হোসনে আরা শাহেদ

এসএসসি পরীক্ষা গেল, এইচএসসি আসছে মে মাসেই, এরপর ডিগ্রীর পালা, তার তারিখ বুঝি এই জুন মাসে। ফাইনাল পরীক্ষাগুলো আজকাল মেলা দিন ধরে চলে, প্রচুর গ্যাপ থাকে রুটিনের মধ্যে, দু'বেলা হওয়ার জো নেই দু পেপার, অমনি নানা কথা ওঠে। সব মিলে পরীক্ষা চলে গোটা মাস জুড়ে, প্র্যাকটিকালের ঝামেলা থাকে যদি, আরও দেড়-দু সপ্তাহ কপাল ঠোকে।

ছাত্রছাত্রীরা আরামে আসানে পরীক্ষা দিক: পরীক্ষার মধ্যে সময় পেয়ে পড়ুক আশ ভরে, সারা বছর তো ও বালাই থাকে না বাছাদের, যতই নজদিক হয় পরীক্ষা, ততই না নোট করা বাড়ে, এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে বই কেনার কথাও মনে পড়ে। সুবিধে আছে, হৃদয়ংগম হওয়ার আগেই পাঠ কণ্ঠস্থ হয়ে যায় কনসেনট্রেশনের গুণে। আপত্তি তাই সেখানে নয়, কেননা শিক্ষার্থীর শিক্ষা চাই আর কজনা, একমাত্র সার্টিফিকেট দেখেই তো পারি খুশী হতে। ব্যতিক্রমধর্মীরাও বা করবেনটা কি, আমরা অধিকাংশই যেখানে ভালোবাসছি গড্ডালিকার স্রোতে গা ভাসাতে।

তবু ভাবনা জাগে। তবু দ্বিধা জমে মনে। কি বছরই চলে এমন পরীক্ষা, গোঁজামিল যে ক্রমশ বাড়ছে এতে, তা যেন ক্রমেই বড় হয়ে নজরে পড়ে। পরীক্ষার হল বলে কোনও ভিনজাতীয় পদার্থ নেই এদেশে, তাই অবস্থা এমন না যে মনের সুখে কালক্ষেপণ করে পরীক্ষা নিলেও কোনই ক্ষতি হবে না তাতে। পরীক্ষাগুলো সাধারণত হয় স্কুলে স্কুলে বা কলেজে কলেজে। এসএসসি হয় স্কুলে, এইচএসসি বা ডিগ্রী হয় কলেজে। শহরতলী এলাকায় বা বাইরের জেলা শহরে কিংবা অন্য কোনও মহকুমা বা থানা এলাকাতে কোথাও কোনও অসুবিধা হলে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় কলেজের দালানে, কখনও বা আবার এইচএসসি বা ডিগ্রী হয় স্কুলের ভবনে অর্থাৎ স্থান, প্রয়োজন, পরিবেশ অনুযায়ী সেন্টার ফেলা হয় অদল-বদল করে। মিলে মিশে

পথের পাঁচালি

কাজ যত হয় তত ভালো, প্রশ্ন তা নিয়ে নয়, জিজ্ঞাসা হচ্ছে, এতে মঙ্গলটা কী হচ্ছে?

পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা যেখানেই হোক, তাতো শিক্ষায়তনই, অতএব পরীক্ষা চলাকালীন বন্ধ দিতে হয় ক্লাস, ফলে ঐ সেন্টারের সকল ছাত্রদের অযাচিত ছুটি মেলে। যে সময়টাতে থাকে পড়ার পুরো চাপ, বিদ্যার্থীরও থাকে পূর্ণ উদ্যম, শিক্ষাবর্ষের বিচারে যাকে বলা যায় ভরা মওসুম, তখুনি কিনা এমন বিরতি পড়ে।

বিরতি না তো, রীতিমত ব্যাঘাতই হয়ে যায়। এইভাবে বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষার কল্যাণে স্কুলের ক্লাস মার খায় প্রায় এক মাস ধরে। কলেজে তো এইচএসসি, গ্রীষ্মকালীন ছুটি, ডিগ্রী, সব মিলে কেবল অবকাশের বাহার বাড়তে থাকে। পড়ুয়াদের লেখাপড়ার বালাই থাকে না আর, টীচাররা থাকেন হল ডিউটিতে।

এমন নয় যে আমাদের ছাত্ররা বই খোলেন ছুটি-ছাটাতে, কিংবা পড়ার চিন্তায় মাথা খাটান বা লাইব্রেরী করেন একনিষ্ঠভাবে। এমনও ভাবার কারণ নেই যে তারা সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন ফুরসৎ পেলে। তারা এসবের ধার ধারেন না। অপরের কল্যাণ দূরে থাক, অকল্যাণজনিত কর্মকান্ডেও তাঁরা গা করেন না। যে কোনও ধরনের বিপুল অবকাশে তাঁরা অবগাহন করেন আলসের অবসাদে। তাস, সিনেমা আই ডেল গসিপ। মারামারি, নিন্দা, পরচর্চা, আমাদের উত্তরসূরীদের সৃষ্টিধর্মী সতত সজাগ মন এমনি করেই ধীরে ধীরে হয়ে পড়ে নির্জীব। তাদের যদি কাজে লাগানো যেত, তাদের নিঃস্বার্থ ও নিবেদিত প্রয়াসে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক সহজ সমাধান বোধ হয় পাওয়া যেতো। হয়তো তাতে নীলমোহর অলা অনেক মুখর কর্মীর লজ্জা পাওয়ার কারণ ঘটতো।

অথচ আমরা তা হতে দিই না। আমরা পরিকল্পনা করি, তার বাস্তবায়নে সক্রিয় হই না। তেমন ভাবে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উদ্দীপ্ত করতেই জানি না। খালি খালি তাদের অভিযোগ করার তো মানে হয় না, তারা এই পরি-

পথের পাঁচালি

(৫-এর পৃঃ পর)

বেশেরই ফসল, তারা আমাদের সন্তান, বাইরের কেউ না।

আমরা বরং উল্টো কাজ করি।

স্কুল-কলেজের হলি ডে লিস্টিতে অজস্র খুচরো ছুটির দিন তৈরি করি। সামার ও রমজান ভ্যাকেশন ছাড়া আর সবই হয় ছুটকো ছুটি। এসব কাজে লাগে কারও। এতে উপকৃত হয় না কেউ, না শিক্ষক, না শিক্ষার্থী। যদি সব জমিয়ে ধান ফসলের সময়ে এক সঙ্গে বেশী ছুটি দেয়া হতো, স্বল্প বেতনভুক গ্রাম নির্ভর মানুষেরা বাড়ি গিয়ে নিজের ঘরবাড়ি ও জমিজমার তদারকী করতে পারতো। ছাত্ররাও উন্নাসিক না হয়ে দেশদরদী হওয়ার শিক্ষা পেতো। তা না, এর উপর সেন্টার খুলে দৈনন্দিন পড়ায় ক্ষান্ত দিয়ে দি। এমনি করে বছরের অর্ধেক পার হয়ে যায়, আর থাকে কী? আছে এ ছাড়াও ঝড়-ঝাপটা, আকস্মিক নানা দুর্বিপাক, অতি গরম, অতি বৃষ্টি। এমনি নানা ছলে ক্লাস বাদ যায়, মহানন্দে দিন পার হয়, ফাইনাল পরীক্ষা এসে পড়ে, সিলেবাস শেষ হোক বা না হোক, চলে ফরম, পূরণ, ফিস প্রদান, পালিত হয় যাবতীয় ফরমালিটি। তারপর সময় পেলে কোচিং, না হলে তাও বাদ, ছাত্ররা পড়বে রাত জেগে নিজের গরজে, অভিভাবক হন্যে হয়ে প্রাইভেট টিউটর খুঁজতে থাকবে, বুদ্ধিমান শিক্ষার্থী রেডিমেড নোটের ফিকিরে থাকবে, ইতিউতি সাজেশন সংগ্রহে অধীর হবে, ফাঁকে ফাঁকে সম্ভব হলে পরীক্ষা, পেছানোর তাবেদার ধরবে, ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র গুচ্ছ টাকা দিয়ে চুপিসারে জোগাড় করতে চাইবে, নিদেনপক্ষে প্রশ্ন আউটের গুজব বাতাসে আছে কিনা তার জন্য কান পেতে থাকবে— চলছে মন্দ না, ভারী চমৎকার এই পরিক্রমাটি।

ফাইনাল পরীক্ষার সেন্টারের ঝামেলা থেকে অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেহাই পায়। সেখানে পরীক্ষার্থী দেয় পরীক্ষা, ক্লাসঅলারা করে ক্লাস যথারীতি পাশাপাশি। কী ভালো যে হতো, সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে এমন হতো যদি।

একে অসম্ভব যদি বলেন কেউ, জানতে সাধ হয় এতো যে এলাকা জুড়ে অডিটোরিয়াম, কম্যুনিটি সেন্টার, তাই বা সম্ভব হয় কী করে? জীবনে কি সভা-সেমিনার বা বিবাহ-অনুষ্ঠানই সব, ছাত্রদের পড়াশোনা বুঝি কিছু না, বুঝি একেবারেই ফালতু, একেবারেই ফাঁকি?